দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় প্রসঙ্গে

রবিবারে প্রকাশিত ইত্তেফাকের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি আদায় অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নির্দেশনাই মানিতেছে না বেসরকারি স্কুলগুলি। ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৪ ডিসেম্বর একটি নীতিমালা জারি করে। নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তির আবেদনের ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ১শ টাকা গ্রহণ করা যাইবে। সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় পাঁচশ' টাকা, উপজেলা সদর এলাকায় এক হাজার টাকা, জেলা সদর এলাকায় দুই হাজার টাকা, ঢাকা মেট্রোপলিটান ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটান এলাকায় তিন হাজার টাকা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় পাঁচ হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাইবে না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এই হারের তুলনায় বেশি আদায় করিলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলিয়াও সতর্ক করা হইয়াছে বেসরকারি স্কুলগুলিকে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সরকারি নীতি-নির্দেশনার কোনো মিল নাই। রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলি নিজেদের করা নিয়ম অনুযায়ী প্রায় ৩ গুণ বেশি ভর্তি ফি আদায় করিতেছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছে, লটারির মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি ছাড়াও ডোনেশন হিসাবে অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে। রাজধানীর অপর একটি স্কুলে ভর্তি ফি বাবদ ৬৭ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে। এই অবস্থায় সীমিত আয়ের অভিভাবকদের দিশেহারা বোধ করাই স্বাভাবিক।

দেশের শহরাঞ্চলে, বিশেষ করিয়া ফলাফলের দিক হইতে সেরা স্কুল হিসাবে পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি যুদ্ধ ও ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ নূতন নহে। মূল কারণ মানসম্পন্ন স্কুলের সংকট। রাজধানীর সহস্রাধিক স্কুলের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটা স্কুল ঘুরিয়াফিরিয়া প্রতি বৎসর ভালো ফল করে। ফলে কে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী - ইহার উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। ভাল স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাইবার জন্য বিগত কয়েক বৎসরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতিযোগিতা মারাত্মক সমস্যা হইয়া দেখা দেয়। শিক্ষাজীবনের শুরুতে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া, মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরাজয় মানিতে হইত হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে। অন্যদিকে তদবির ও ডোনেশন বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়ও পরাস্ত হইতে হয় অধিকাংশ অভিভাবককে। এই সমস্যা সমাধানে ভর্তি পরীক্ষার বদলে লটারির মাধ্যমে ভর্তির নিয়ম-নীতির প্রচলন করিয়াছে ভাল স্কুলগুলি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভর্তিযুদ্ধের উদ্বেগ-উত্তেজনার অবসান ঘটিলেও বেসরকারি স্কুলগুলির বাড়তি অর্থের চাহিদা কমিয়া যায় নাই। বরং বাড়িয়াছে অনেক ক্ষেত্রে।

বেসরকারি স্কুলগুলির অধিকাংশ শিক্ষকই এমপিওভুক্ত। সরকারি কোষাগার হইতেই তাহারা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহাছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নেও সরকার বিভিন্ন শর্তে অনুদান দিয়া থাকে। তবে মানসম্পন্ন অনেক নামিদামি স্কুলেও এমপিওভুক্ত শিক্ষক ছাড়াও বহু শিক্ষক-কর্মচারি রহিয়াছেন। শিক্ষকদের বাড়তি অর্থ দেওয়া ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও তাহাদের অর্থের প্রয়োজন। সরকার তাহাদের প্রয়োজন শতভাগ পূরণ করিতে পারে না বলিয়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির জন্য পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত বা অনুমোদন নিয়াই তাহারা সরকার নির্ধারিত হারের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ/ডোনেশন আদায়ের নিয়ম করিতেছে। ফলে জিম্মি হইয়া পড়িতেছেন সীমিত আয়ের অভিভাবকরা। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এমন নীতি-নির্দেশনা করিয়া দিয়াই সরকারি দায়িত্ব শেষ হইতে পারে না। বাস্তবায়ন অযোগ্য নীতিমালা করিয়া কী লাভ? আমরা মনে করি উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানসম্পন্ন শিক্ষা সহজ-সুলভ করিবার বিষয়টি শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ সরকারি সহায়তার শর্তে যথাসম্ভব নিশ্চিত করিতে হইবে। এ ব্যাপারে কার্যকর নীতিকৌশল অবলম্বন করিয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি বাড়াইতে হইবে অবশ্যই। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় নিয়া নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি কাম্য নহে।